কলমিফুলের রাত

মুহাম্মদ ফজলুল হক

স্বরবর্ণ

কলমিফুলের রাত
মুহাম্মদ ফজলুল হক

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০২১

প্রকাশক
স্বরবর্ণ
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৮৭-০০৭০৩০
Email : nfo.shoroborno@gmail.com

পরিবেশক
মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
quickkcart.com

প্রচ্ছদ
আখতারুজ্জামান

মুদ্রণ
শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা

মূল্য
১৬০ টাকা

©
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

Kolmifuler Raat By Mohammod Fazlul Haque, Published by : Shoroborno, 1st Edition : March 2021, Price Tk. 160, ISBN : 978-984-8012-71-0

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর

মো. মকবুল হোসেন

যিনি পেশায় একজন শিক্ষক কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ের গণ্ডিকে ছাড়িয়েও তাঁর শিক্ষকতার ক্ষেত্র পরিবার, সমাজ ও আশপাশের জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত; নিতান্ত হতভাগা ছাড়া তাঁকে ভালো না বেসে কেউ থাকতেই পারে না।

ও

আমার শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি

মোছা. নূরুন্নাহার বেগম

যিনি বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে আশপাশের মানুষের দুঃখ-বেদনাকে নিজের করে নিয়ে মমতার ছায়া বিস্তার করেন।

লেখকের কথা

এটি কি একটি প্রেমের উপন্যাস? সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা কঠিন।

ইসলামি জীবনবিধানে নর-নারীর প্রেমকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে বাজারে প্রচলিত প্রেমের থেকে ইসলামি জীবনবিধানে প্রেমকে ভিন্ন আঙ্গিকে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এখানে প্রেমের আলাদা সৌন্দর্য আছে, প্রশান্তিময় গভীরতা আছে। অন্তর্মুখীতা যার বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিকে যা পরিশীলিত করে। জীবনের গূঢ় রহস্য যাতে ধরা পড়ে।

এ উপন্যাসে বাজারে প্রচলিত প্রেম এবং ইসলামি জীবনবোধের প্রেমের পার্থক্যটা চিত্রায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান দুইটি চরিত্রের মনোদৈহিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে তার একটি পরিণতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক। নিজেকে আধুনিক ভাবতে গিয়ে সে পারিবারিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বোধ থেকে নিজের অজান্তেই সরে যায়। ফলে সে চারিত্রিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। সে হয়ে যায় প্রবৃত্তির দাস। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, সে হয়ে যায় শয়তানের ক্রীড়নক। গভীর জীবনবোধ থেকে সে বঞ্চিত হয়। বার বার ধোঁকা খেয়েও সে জীবনের সরল পথে পৌঁছাতে পারে না।

পক্ষান্তরে উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রটি ধর্মীয় বোধে আবিষ্ট। গভীর জীবনবোধ থেকে জন্ম নেওয়া দায়িত্বশীলতা থেকে সে তার আপনজনকে উদ্ধার করে।

উপন্যাসের আরেকটি আলোচিত দিক হলো ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারণার অভিনব কৌশল উন্মোচন করা। উপন্যাসের ভেতর দিয়ে তা আনা হয়েছে যাতে করে বেশি-সংখ্যক মানুষ এই কৌশলটির ব্যাপারে জানতে পারেন।

আমার অন্য সব উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসেও চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে সহজেই পাঠক চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন।

পরিশেষে **স্বরবর্ণ** কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার চিন্তালব্ধ কর্মকে পাঠকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

মুহাম্মদ ফজলুল হক
সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ
ত্রিশাল মহিলা ডিগ্রি কলেজ

এক

ইউসুফ এসে রেলিং ধরে দাঁড়ায়। সুবহে সাদিকের হিমেল বাতাস তার দেহ-মনে একটা দোলা দিয়ে যায়। সামনেই ছোট বাগান। আবছা অন্ধকারে সদ্য ফোটা ফুলের অস্তিত্ব চোখ শনাক্ত করতে না পারলেও আনকোরা ঘ্রাণটাই বলে দেয়, রাতের ওমে মায়ের মমতার মতো গাছের কোল জুড়ে বেরিয়ে এসেছে থোকা থোকা ফুল। পুবের আকাশ লাল শাড়ি পরে হয়েছে মোহনীয়। রাতের বুক চিরে দিবসের উদয়ের পূর্বাভাস। আকাশের তারাগুলো লজ্জায় মিলিয়ে গিয়ে ফিকে হতে শুরু করেছে। শেষ রাতের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ বাতিল প্রেমিকের মতো নিস্প্রভ হওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত।

দিবসের আগমনবার্তা জানাতে প্রকৃতির এই বিশাল বিপুল সমারোহ ইউসুফের বুকের ভেতর মৃদু একটি ধাক্কা দিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সংকল্পটায় কেমন আলগা টান লাগে। স্নেহাতুর মায়ের স্বপ্নাতুর চোখের শিশিরের মতো ঝুরঝুরে স্বপ্নগুলো তাকে আরেকবার ঝাপটা দিয়ে যায়। জননী অন্তিম শয়নে। আয়ু তার নিভু নিভু। যেকোনো সময় তলব আসতে পারে। কিন্তু তার চোখ দুটো স্বপ্নোদ্ভাসিত। আয়ুহীন জীবনের ভাবনা তাকে কাবু করে না। প্রশান্ত গাম্ভীর্যে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। জীবনের পাওনা তিনি চুকিয়ে দিয়েছেন। কেবল একটি কাজ বাকি ছিল। ইউসুফের বিয়ে। গতরাতে তারও একটা রফা করে দিয়েছেন। ইউসুফের হাত ধরে তিনি বলেছেন, আল্লাহর রহমতে আমার কথা রেখে কেউ কোনোদিন ঠকেনি। আশা করি তুইও ঠকবি না। আমি বলছি, বুশরা ভালো মেয়ে। তুই সুখী হবি।

সুখ! কথাটা ইউসুফের বুকের ভেতরে অবলা শিশুর রথ চালনার দুর্মর ইচ্ছের মতো হামাগুড়ি দিতে থাকে। ইউসুফের মনে হয়, সুখ ঘুষের মতো সহজলভ্য কোনো জিনিস নয় যে, চাইলেই পাওয়া যাবে। কোথাকার কোন বুশরা না ফুশরা, যাকে কখনো সে চোখেই দেখেনি, তাকে নিয়ে পাবে সে সুখ! সে ভালোবাসে শান্তনাকে। গত দুটি বছর ধরেই যাকে নিয়ে সুখের সৌধ নির্মাণ করেছে সে। পার্কে-রেস্টুরেন্টে যার সঙ্গে সুখের কেনা-বেচা করেছে সে, কিছুটা বাকিতে কিছুটা নগদে। বুশরা নামক এক বুলডোজারের গুঁতোয় সেই

কল্পিত জমাট সুখের সৌধ কুপোকাত করে সে পাবে সুখ! একটা দীর্ঘশ্বাস ইউসুফের বুক ঠেলে বের হয়।

দোতলার বারান্দায় ইউসুফ অস্থিরভাবে পায়চারি করে। গতরাত পর্যন্ত মায়ের আসন্ন মৃত্যুকে নিয়েই সে বিপর্যস্ত ছিল। তার বাবা গত হয়েছেন বছরপাঁচেক আগে। ভাইবোনও আর কেউ নেই। মা চলে গেলে আর থাকল কী? খবরটা শোনার পর থেকেই অনেক কেঁদেছে ইউসুফ। সারাটা দিন মায়ের কাছছাড়া হয়নি। চোখ থেকে আপনা-আপনিই বেরিয়ে এসেছে পানির ধারা। মার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেই কষ্টের আভাস তার মুখটিকে বিকৃত হতে দেয়নি। কেবল থেকে থেকে চোখের কিনার বেয়ে পানি বেরিয়ে এসে বালিশ ভিজিয়েছে।

মা বলেন, কাঁদিস কেন বাবা?

অভিমানে গুমরে ওঠে ইউসুফ।

: তোমার অত বড় অসুখ তা জানাওনি কেন?

: জানালেই কী করতি তুই? তুই কি আর আয়ু দিতে পারতি?

: চেষ্টা তো করতে পারতাম।

: দূর পাগল! চেষ্টা কি কম হয়েছে? শোন বাবা, মৃত্যুরোগের কোনো ওষুধ নাই।

মার ক্যান্সার, ব্লাড ক্যান্সার। মাসতিনেক আগে ধরা পড়ে রোগটা। ইউসুফ তখন এম. এ ফাইনাল দিচ্ছে। মা জেনে যান তার আয়ু শেষ। কিন্তু ইউসুফের সামনে পুরো একটা জীবন। সেই জীবনের প্রয়োজনীয় রসদ এম. এ ডিগ্রিটা তার খুবই দরকার। ইউসুফকে তিনি ভালোবাসেন। কিন্তু সেই ভালোবাসায় অন্ধ আবেগের কোনো মাতোয়ারা ভাব নেই। তার ভালোবাসায় ইউসুফের আলোকিত ভবিষ্যৎই গুরুত্ব পায়। সন্তানকে কাছে পাওয়ার আকুলতাকে তিনি বুকের গহিনে চেপে রেখে বিবেচনাবোধটাকেই সামনে রাখেন। জীবনের এই অন্তিম যাত্রাপথে সন্তানের সাহচর্যের জন্য প্রায়ই তিনি আকুল হয়েছেন। কিন্তু ঘাতক ক্যান্সারও তাকে তার বিবেচনাবোধ থেকে সরাতে পারেনি। তার বিবেচনাবোধ তাকে জানায়, এ সময় ইউসুফকে অসুখের খবরটা দিতে নেই। দিলে পড়ালেখার ক্ষতি হবে। এমনকি পরীক্ষাটা হয়তো আর কোনোদিনই দেওয়া হবে না।

ইউসুফের দুই চাচা। আকবর হোসেন আর কামরান হোসেন। তাদের পরিবারটা খানদানি। একসময় তালুকদারি করত। এখন অবশ্য কোনো তালুক

নেই। এজমালি ব্যবসা আছে। ইটভাটার ব্যবসা। পাঁচ-পাঁচটি ইট ভাটা, দশটি ট্রাক, ময়মনসিংহ জেলা শহরের সবচেয়ে বড় সিমেন্টের দোকানটি তাদের। চাচারাই দেখাশোনা করেন। কিন্তু পারিবারিক রীতি অনুযায়ী মা তাদের মাথার ছাতা হয়ে থাকেন। খানদানি, ধার্মিক ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন পরিবারে বৈষয়িক লোভের কোনো কামড়াকামড়ি নেই। মোটকথা তিন শরিকের পরিবারটির রান্নাবান্না আলাদা হলেও সবকিছুই চলছে সাবেকি আদলে।

ক্যান্সারের কথাটা ইউসুফ গতকালই জেনেছে। ইদানীং মার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। ক্রমেই কাহিল হয়ে যাচ্ছিলেন। ইউসুফ তিন মাসের মধ্যে দুবার এসেছে মার কাছে। মার অবসন্নতা তার চোখেও লেগেছে। মাকে জিজ্ঞেসও করেছে। মামুলি শরীর খারাপ বলেই মা এড়িয়ে গেছেন। আর ইউসুফের মাথায় পরীক্ষা ও শান্তনার সাময়িক বিচ্ছেদটা জেঁকে বসে ছিল। বিশেষ করে শান্তনাকে একদিন না দেখলেই তার ভেতরে শীতের কুয়াশা পড়া শুরু করে। সেই কুয়াশা ভেদ করে অন্যকিছু আবছাভাবে দেখা গেলেও কুয়াশার হিমেল অনুভবকে হটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাই তো ইউসুফ তার দৃষ্টিটাকে মায়ের অতলান্ত গভীরতায় নিয়ে যেতে পারেনি। পারলে মায়ের ছাপিয়ে যাওয়াটা বুঝত। মায়ের অন্তিম যাত্রার আয়োজনও টের পেত।

ইউসুফের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তিন দিন আগের ঘটনা। হল থেকে বেরোতেই চোখ পড়ে শান্তনার ওপর। হাতের কাজ করা নতুন সেলোয়ার কামিজে শান্তনাকে কল্পলোকের রাজকন্যার মতো লাগে। শরীর ভারী না, আবার পাতলাও না। কাঁচা হলুদের রং। নাকটা বাঁশির মতো। নীলাভ চোখ দুটো অসম্ভব মায়াবী। পানপাতা আকৃতির মুখটিতে স্বচ্ছ আয়নার মতো রাগ-অনুরাগের ছবি ভেসে ওঠে।

ইউসুফকে দেখেই শান্তনা ভুবন ভোলানো হাসি হাসে।

: কী, পোষানোর মতো পরীক্ষা হয়েছে?

: তা হয়েছে।

: তা হলে তো তুমি মুক্ত বিহঙ্গ।

: বিহঙ্গ, কিন্তু মুক্ত নই। সুতোটা তো তোমার হাতে।

ইউসুফ আর শান্তনা সেদিন রিকশায় অনেক ঘুরেছিল। মাঝে লাঞ্চটাও সেরেছিল হোটেলে। সেরেই আবার পথে। যেন পথের নেশায় পেয়েছে দুজনকেই। ঢাকা শহরের রাস্তা রিকশা-মোটরে ঠাসা। সিগনাল ছাড়াও থামতে হয় এখানে-সেখানে। কিন্তু তাতেও বিরক্তি আসেনি কারও। শেষে শান্তনা বলে, এবার যাওয়া দরকার। আব্বা-আম্মা চিন্তা করছেন।

ইউসুফকে পথের নেশা ছাড়তে হয়। শান্তনাকে তাদের বাসার কাছাকাছি গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে রিকশা ছেড়ে দেয়।

শান্তনা বলে, সন্ধ্যায় তাহলে আসছ?

: আসতে তো হবেই। কিন্তু আমার এখনই টেনশন লাগছে।

: শুধু শুধু টেনশন করো না তো। আমি আব্বাকে তোমার সবকিছুই বলেছি। আব্বা হিসেবি মানুষ। নিশ্চয় তিনি তোমার সব খোঁজখবর নিয়েছেন।

: কেমন বুঝলে, পোষাবে?

: মনে হয়। না পোষালে আব্বা নিজে তোমাকে আসতে বলতেন না। আর শোন, তুমি কিন্তু বাড়ি গিয়ে মাকে সব খুলে বলবে। আব্বা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার আম্মা ব্যাপারটা জানেন কি না।

: না জানলেও ক্ষতি নেই। আম্মা কিছুতেই অমত করবেন না।

: আজকাল প্রেমের রোমান্সও কেমন ফিকে হয়ে গেছে। বাবা-মায়েরা আর আগের মতো গাঁইগুঁই করে না।

: আমার বাবা গাঁইগুঁই শুনে রোমান্স তৈরি করার শখ নেই।

ইউসুফ চলে এসেছিল। আর যাওয়া হয়নি। হলে এসে শরীর ছেড়ে শ্বাস নিতেই মেঝো চাচার ফোন আসে।

: হ্যালো ইউসুফ, তুই এক্ষুনি বাড়ি চলে আয়।

: চাচা, কোনো সমস্যা।

: হ্যা, তোর মা'র অসুখটা বেড়েছে।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে ইউসুফের।

: আম্মার কী হয়েছে চাচা?

চাচা ভারী গলায় বললেন, তুই আয়, সব জানবি। তোর পরীক্ষা, তাই খবরটা তোকে জানাইনি।

না, ইউসুফ দেরি করেনি। ব্যাগে জামাকাপড় ভরতে যা সময় লেগেছে।

ময়মনসিংহ শহরের খানদানি বাড়িগুলোর একটি হলো তালুকদার বাড়ি। এক একর জমির ওপর পাঁচিলঘেরা বাড়িটির গেইটটাই বলে দেয়, বাড়ির মালিকরা কোনো হুজুগে বড়লোক নয়। প্রধান ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত তিনতলাবিশিষ্ট একটি মনোরম প্রাসাদ। প্রাসাদের সামনে থেকে প্রধান ফটক পর্যন্ত পনেরো ফুট চওড়া পাকা রাস্তাটির দুপাশের বাগানে বিদেশি বাহারি গাছ। মোটকথা বাড়ির ভেতরে পা

রেখেই যেকোনো আগন্তুক বাড়ির মালিকদের শৌখিনতা ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবে।

ইউসুফ ফটক পেরিয়ে বাড়ির সামনে আসতেই চাচা আকবর হোসেন তালুকদারের মুখোমুখি হয়। তার মুখটা থমথমে। ইউসুফ সালাম দিয়ে চাচাকে জিজ্ঞেস করে, আম্মার কী হয়েছে? আকবর হোসেন তালুকদার স্থির দৃষ্টিতে ইউসুফের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শীতল কণ্ঠে বলেন, ক্যান্সার!

ইউসুফের বুক চিরে বন্য হাহাকার বেরিয়ে আসে, ক্যান্সার! আকবর হোসেন দু-পা এগিয়ে এসে ইউসুফের কাঁধে হাত রাখেন। বলেন, বাবা ইউসুফ, তুই তোর মায়ের একমাত্র সন্তান। জীবনের অন্তিম সময়ে এসেও তোর মা তার কর্তব্য থেকে একচুলও সরে আসেননি। তোর ভালোর জন্য বুকে পাথর বেঁধে তিনি রোগযন্ত্রণা বয়ে বেড়িয়েছেন। তোর পরীক্ষার কথা ভেবে খবরটা তোকে জানাননি। আজ তোর পরীক্ষা শেষ হয়েছে আর তোর মায়ের জীবনের শেষ সময়ও ঘনিয়ে এসেছে।

বুক ভেঙে ইউসুফের কান্না আসে। তার চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

চাচা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন, কাঁদিস না বাবা। তোর মা অনেক বড় মাপের মানুষ। মানুষ মরে, কিন্তু তার আদর্শ মরে না। যা, ওপরে যা। আর শোন, কষ্ট করে হলেও তার সামনে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করিস।

বরাবরই মার সঙ্গে ইউসুফের ব্যবহারটা ছিল বন্ধুর মতো। কিন্তু সম্ভ্রান্ত মর্যাদাবোধের এক অনতিক্রম্য দেয়াল টপকে সেই সম্পর্কটি একাকার হয়ে যায়নি। ইউসুফের মনের গহিনে মায়ের বেশ কয়েকটি ছবি বাধানো আছে। কিন্তু হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার দৃশ্যের কথা কখনো সে ভাবেনি। মাত্র একটা মাসের ক্যান্সারের আক্রমণ একজন মানুষকে এমন বদলে দিতে পারে, তা কল্পনায়ও আসে না।

বিছানায় লেপটে থাকা মায়ের কঙ্কালসার দেহটা চোখে পড়তেই ইউসুফ আর্তনাদ করে ওঠে, তোমার এই অবস্থা কেমন করে হলো আম্মা?

ছেলেকে দেখে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে যান মা। মুখ থেকে কোনো কথা বেরোয় না। কেবল নিঃশব্দ কান্নায় গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু।

ইউসুফ নিজেকে বশে রাখতে পারে না। মায়ের শিয়রে বসেই সে শিশুর মতো ফোঁপাতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর মা তার শীর্ণ হাতটা ইউসুফের হাতের ওপর রাখেন, গলা দিয়ে কথা বেরোতে চায় না। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, কাঁদিস না বাবা, মা কি কারও সারাজীবন বেঁচে থাকে?

সময় থেমে থাকে না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়েই তালুকদার বাড়িতে রাত নামে, প্রভাত হয়। সূর্যের আকাশ প্রদক্ষিণের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই গেরস্থালি নিত্যকর্ম চলতে থাকে। কিন্তু তালুকদার বাড়ির একটি ঘরে সময় থমকে দাঁড়িয়ে যায়। মার সকাল-সন্ধ্যার হিসেব থাকে না। সকাল আর সন্ধ্যার ভেতরে একটা আলাদা বৈচিত্র্য আছে, আছে ভালোলাগা-মন্দলাগা। জীবনের সুস্থতার মাঝেই সময়ের এই সূক্ষ্ম কারুকাজ মোহনীয়ভাবে ফুটে ওঠে। প্রতিটি সকাল-বিকেলের মধ্যে জীবনের এক গোপন প্রসাধনীর চর্চা চলে। শারীরিক সুস্থতাই সেই চর্চিত রূপের বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবনের রংধনু হয়ে উদিত হয়। অর্থহীন নয়, বেঁচে থাকাটা হয়ে ওঠে অসম্ভব অর্থবহ। কিন্তু মার ঘরে জীবনের রঙিন চিত্র ফিকে হতে হতে হয়ে গেছে সাদাকালো। মা জানেন, সাদাকালো রংও একসময় থাকবে না। মৃত্যুর কালো পরিণতিই অপেক্ষা করছে তার জন্য। কিন্তু তবুও মানুষের আশা ফুরোয় না। মানুষের এই দিকমাত্রাহীন আশাই তাকে ভুলিয়ে রাখে। মৃত্যুর কুৎসিত মানচিত্র ধরে হাঁটতে হাঁটতে মানুষ আশার বিভ্রমে পড়ে জীবনকে স্বচ্ছন্দে বয়ে নেয়। তাই তো আশাই জীবন। মা জানেন, তিনি পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছেন চলে। কিন্তু তিনি এও জানেন, সন্তানের ভেতর দিয়েই কেবল পিতামাতারা বেঁচে থাকতে পারেন। আর সুস্থ জীবনধারা গড়ে তুলতে হলে অন্যতম শর্ত হলো একজন আদর্শ জীবনসঙ্গিনী।

মা লোকমুখে শুনেছেন, ভার্সিটিতে এক মেয়ের সঙ্গে ইউসুফের বেশ জানাশোনা আছে। মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু স্নিগ্ধতার চেয়ে সৌন্দর্যের চটক বেশি। যৌবনের অগভীর দৃষ্টি স্নিগ্ধতার চেয়ে চটকতাকে বেশি প্রশ্রয় দেয়। ইউসুফ ছেলেমানুষ। হয়তো সে মেয়েটাকে শুধু চোখের দেখায়ই মেপেছে। যা সব যুবকই মেপে থাকে। কিন্তু শুধু চোখে মাপলেই তো হয় না, চোখের সঙ্গে সঙ্গে মাথা আর বুকের ভেতরের হৃদয়কে কাজে লাগাতে হয়। কিন্তু যৌবনের সময়টা এ কাজের জন্য যথেষ্ট বিশ্বস্ত নয়। প্রায় সময়ই যৌবন বুদ্ধি-বিবেককে হটিয়ে দিয়ে চোখের দেখাকেই বড় বেশি প্রাধান্য দেয়। তাই তো ইউসুফের চোখের মাপজোকের পছন্দের মেয়েটির ওপর মা ভরসা রাখতে পারেন না। মা জানেন, এতে ইউসুফ সাময়িক কষ্ট পাবে, কিন্তু সে বিদ্রোহী হবে না। আর ইউসুফ না জানলেও মা জানেন, নাটক-নভেলের হা-হুতাশ করা জীবনের সমান এ কষ্ট নয়, বরং বাস্তবের জীবন লন্ডভন্ড করার কষ্ট এটা। অনেকেই অবশ্য খেই

হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ইউসুফের মানসিক গঠনটা বেশ মজবুত। আবেগ নয়, সে সবসময় বুদ্ধিকেই এগিয়ে রাখে। তা ছাড়া বুশরা শুধু সুন্দরীই নয়, বুদ্ধিমতিও। তার সৌন্দর্যের ছটা তার বিদুষিতাকে অতিক্রম করে যায়নি। সৌন্দর্যের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা মিলে পাহাড়ি ঝরনার মতো এক নির্মল টলটলে স্নিগ্ধতা তাকে অনেকের থেকে আলাদা করে রাখে। কিছু কিছু মেয়ে আছে, যাদের পুরো শরীর নয়, কেবল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বুশরা সেই ধরনের মেয়ে। তার লাবণ্যময় স্নিগ্ধতা পুরুষকে উসকে দেয় না, জুড়িয়ে দেয়। সেই জুড়িয়ে যাওয়ার রেশ ধরেই পুরুষ জীবনের অর্থ খোঁজে।

বুশরা তার মায়ের চেহারা এবং বাবার জীবনদৃষ্টি পেয়েছে। বুশরার আম্মা খাদিজা বেগম ইউসুফের আম্মার বান্ধবী। খাদিজা বেগমের বিয়ে হয়েছিল ত্রিশালের কোনো এক গ্রামে। দুই বাল্যসখীর গ্রামের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ শহরের কাছেই, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে পলিবিধৌত গ্রাম নাওভাঙায়। গৌরিপুর থানার ভাংনামারী ইউনিয়নের নাওভাঙা গ্রামের একসময় নামডাক ছিল খুব। এই গ্রামেরই দুটি খানদানি পরিবারে দুজনের জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং একসময় স্বামীর ঘরে চলে যাওয়া। ইউসুফের আম্মা শরীফা বেগম ধনাঢ্য তালুকদার পরিবারের বউ হয়ে এসেছিলেন। আস্তে আস্তে শহুরে কায়দাকানুন রপ্ত করে শরীফা বেগম পাকা শহুরে আভিজাত্য ধারণ করেন। এদিকে খাদিজা বেগমের বিয়ে হয় একজন পাগলাটে শিক্ষকের সঙ্গে। পৈতৃক জমিজিরাত আর মাস্টারির পয়সায় খাদিজা বেগমদের অবস্থাটা যথেষ্ট ভালো হওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু হয়নি। সংসারে থেকেও তুখোড় সংসারবিরাগী হাসান মাস্টারের বাড়তি টাকা পুরোটাই ব্যয় হয় ধর্মপ্রচারের কাজে। নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো মহাজাগতিক কর্মতৎপরতা চালানোর এক পর্যায়েই তালুকদার সাহেবের সঙ্গে তার দেখা হয়।

বছরপাঁচেক আগের কথা। দুই বাল্যসখীর দেখাসাক্ষাৎ বলতে গেলে বিয়ের পর থেকেই বন্ধ। প্রথম প্রথম ঈদ-পার্বণে বাপের বাড়িতে দুজনের সাক্ষাৎ হতো কদাচিৎ। শরীফা বেগম অবশ্য সম্পর্কটাকে চালু করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু খাদিজা বেগমের তেমন একটা গরজ দেখা যেত না। ফলে পরিচর্যাহীন বাগানের মতো সম্পর্কটাও অদেখা আগাছায় ছেয়ে যায় এবং একসময় পরস্পরকে মনে পড়ার মতো মোলায়েম টানটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইউসুফের আব্বা তালুকদার সাহেব আর বুশরার আব্বা হাসান মাস্টার ঘোর অপরিচয়ের ভেতর দিয়েই একদিন কাছে আসেন। তালুকদার সাহেব তখন তার ব্যবসায়িক দফতরে। চেয়ারে বসে নিবিষ্ট মনে হিসেব দেখছেন। এমন

সময় হাজির হন হাসান মাস্টার। উশকোখুশকো চেহারা ও জামাকাপড় দেখে তাকে ভিক্ষুক থেকে ভবঘুরে যেকোনো শ্রেণিতেই ফেলা যায়। তো সালাম দিয়ে হাসান মাস্টার দফতরের খালি চেয়ারটিতে বসে পড়েন তালুকদার সাহেবের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই। তালুকদার সাহেব এই ভিক্ষুক কাতারের দুঃসাহসিক আগন্তুকের আচরণে বিস্মিত হয়ে ভ্রুকুঞ্চিত করে বলেন,

: কী ব্যাপার? কী চাই?

ভদ্রলোকদের এইসব দূর-দূর ব্যবহারের সঙ্গে হাসান মাস্টারের দীর্ঘদিনের জানাশোনা। তাই এসবে তার মন-প্রাণ এখন বিগড়ে যায় না। তিনি স্বাভাবিকভাবেই বললেন,

: আমি হাসান মাস্টার। ত্রিশালের একটি হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক।

তালুকদার সাহেবের সংশয় কাটেনি। তা ছাড়া ইট-সিমেন্ট কেনার মতো পকেটের জোর যে এই উটকো লোকটির নেই, তা তার বেনেবুদ্ধিই তাকে জানিয়ে দেয়। তাই তার ব্যবহারটি ক্রেতা-তোয়াজের মতো মোলায়েম না হয়ে অনেকটা খটখটেই থেকে যায়। বলেন,

: মাস্টারি তো করেন ইস্কুলে। এখানে কী চাই?

: জনাবের সঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে আমি কথা বলতে এসেছি। অনেকের মুখে আপনার তারিফ শুনেছি। দ্বীনের মেহনতের জন্য দানখয়রাতের হাত নাকি জনাবের অতিশয় প্রশস্ত।

হাসান মাস্টারের তোয়াজে তালুকদার সাহেব বিগলিত না হয়ে বরং কূটকৌশলী হয়ে যান। পোশাক-আশাকে বলছে লোকটা অভাবী, তার ওপর আবার দানখয়রাত নিয়ে ব্যাটা মালিশ দিচ্ছে; নিশ্চয় কিছু হাতানোর ধান্দায় আছে। তালুকদার সাহেব মুখ খুললেন।

: দানের হাত আমার খুবই প্রশস্ত, তা ঠিক না। তবে একেবারেই যে দিই না, ঘটনা এমনও নয়। কিন্তু আপনি মাস্টার মানুষ হয়ে এসব কেন বলছেন, বুঝতে পারছি না।

হাসান মাস্টার একটু হাসার চেষ্টা করেন,

: ভাইজান অবশ্য কথা একদম সলিড বলেছেন। আসলে কাজটা আমার না। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো করতে হবে। মুন্সি মেহেরুল্লা ছিলেন দরজি, স্কুলকলেজেও যাননাই, কিন্তু তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। মিশনারিদের প্রচারিত পুস্তক-পুস্তিকার মিথ্যা রদ করতে তাকেই কলম ধরতে হয়েছিল। মুন্সি

মেহেরুল্লা আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু মিশনারিরা আছে, তাদের প্রচারিত মিথ্যাচার আছে। কই, নতুন কোনো মেহেরুল্লাকে তো আমরা পাইনি।

কথা শেষ না করেই হাসান মাস্টার তার ঝুল ব্যাগে হাত দেন। তালুকদার সাহেব বেশ কৌতূহলী হয়ে এই সন্দেহজনক লোকটিকে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। ঝুলনা ব্যাগ থেকে হাসান মাস্টার একটা বই বের করেন। তালুকদার সাহেব ভাবেন, দ্বীনি কোনো বই বুঝি।

হাসান মাস্টার আবার বলতে থাকেন, এই যে দেখছেন বইটা, এইটার নাম *আল্লাহর চিরন্তন কালাম*। এই বইটার মলাটের পেছনে দেখেন বড় বড় অক্ষরে কুরআন শরিফের আয়াত লেখা আছে। এই যে দেখেন, সুরা আন-আমের ১১৫ নম্বর আয়াত, 'সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাহার বাক্য পরিবর্তন করবার কেউ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' এরকম বিশ পঁচিশটি আয়াত আছে এই বইটিতে। কিছু বুঝলেন জনাব?

তালুকদার সাহেব একটু বিরক্তি নিয়ে বলেন, এতে বোঝাবুঝির কী আছে। আল্লাহর চিরন্তন কালাম বইটিতে কুরআন পাকের কালাম লেখা থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।

: জনাব খুবই যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন। কিন্তু জনাব, আপনার বোধ হয় জানা নেই, এই বইটি ইসলামি কোনো বই না। এটি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত মিশনারিদের বিনে পয়সায় বিলানো বই। বসা থেকে তড়াক করে দাঁড়িয়ে প্রায় কেড়ে নেওয়ার মতো করে বইটি নিতে নিতে বলেন, বলেন কী! দেখি দেখি! তালুকদার সাহেব আনমনে চেয়ারে বসে পুস্তিকাটির পৃষ্ঠা উলটাতে থাকেন। হাসান মাস্টার তাকে দেখার সুযোগ দেন। অনেকক্ষণ পর তালুকদার সাহেব বইটি ফেরত দিয়ে বলেন,

: কী সাংঘাতিক! কুরআন-হাদিস থেকে শুরু করে পরিভাষাটাও ইসলামি। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝার উপায়ই নেই যে, বইটা অন্য ধর্মের। আচ্ছা, খ্রিষ্টান মিশনারিরা এই কৌশল নিয়েছে কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসান মাস্টার বলেন, ভাইজান, আমাদের দেশে মুসলমানের অভাব নাই। কিন্তু আমাদের নাকের ডগায় বসে মিশনারিরা তাদের কর্মতৎপরতা চালাচ্ছে এবং অত্যন্ত সফলভাবে। না, আমি মিশনারিদের কোনো দোষ দেখি না। তাদের প্রচারিত ধর্ম মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু তাদের মানবসেবার মানসিকতা এবং একাগ্রতাকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। তারা আরামকে হারাম করে পাহাড়-জঙ্গল চষে নিঃস্ব উপায়হীন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, যা আমরা পারি নাই। এর ফলও তারা পেয়েছেন হাতে হাতে।

সেবার মোহে আবিষ্ট হয়ে প্রায় সব উপজাতিগোষ্ঠী বর্তমানে খ্রিষ্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বছরতিরিশেক আগেও সারা দেশে খ্রিষ্টানের সংখ্যা ছিল ৫ লাখ। বর্তমানে এই সংখ্যা কোটির কাছাকাছি।

: কোটির কাছাকাছি!

: জি জনাব। দশ-বিশ বছর পর তাদের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করাটাও অসম্ভব কোনো ব্যাপার না।

: বলেন কী!

: জি জনাব, ঘটনা যেভাবে ঘটছে তাতে তা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বর্তমানে প্রায় সব পাহাড়ি উপজাতিগোষ্ঠী খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত। নিচু বর্ণের হিন্দুরাও অনেকেই খ্রিষ্টান হয়ে গেছে। অর্থাৎ মুসলমান ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়েও তাদের মিশন আশাতীতরকম সফল। এই অবস্থায় ধর্মপ্রচার অব্যাহত রাখতে হলে তাদের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রটি নতুন করে বিন্যস্ত করতে হয় এবং এই কারণেই বর্তমানে তারা মুসলমানদের টার্গেট করে তাদের ধর্মপ্রচারের একটি নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে।

: কী সাংঘাতিক!

: জি জনাব, খুবই সাংঘাতিক ঘটনা। তবে তার চেয়েও ভয়ংকর কথা হলো, আমরা এসবের কোনো খবরই রাখি না। দেশে প্রতিবছর হাজার হাজার ইসলামি বই বেরুচ্ছে। সব বইয়ের মান যে ভালো, তাও না। কিন্তু মিশনারিদের কৌশল নিয়ে কলম ধরছেন এমন লেখকের সংখ্যা খুবই কম।

: খুবই উদ্বেগের কথা। আচ্ছা, মিশনারিদের কৌশলটা কী? এই ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করে এবং কুরআন-হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে তারা কী করতে চায়?

: জনাব, এসব অনেক কথা। আপনি তো জানেন, কুরআন শরিফে আসমানি কিতাব ইনজিল, তাওরাত ও জাবুরের অনেক প্রশংসা আছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর আসমানি শিক্ষাকেও আল্লাহ সঠিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য ওই কিতাবগুলোর বিকৃতির কথা এবং পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর শিক্ষা ও বিষয়সমূহকে কুরআনের ভেতর দিয়েই সংরক্ষণ করা হয়েছে তাও বলা আছে। কিন্তু মিশনারিরা করছে কী, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর শিক্ষাধারাকে প্রশংসা করে অবতীর্ণ আয়াতগুলো উল্লেখ করে তারা প্রচার করছে যে, বর্তমান বাইবেলটি অবিকৃত আসমানি কিতাব তাওরাত, জাবুর ও ইনজিলের সমষ্টি। মিশনারিরা দাবি করছে, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্যই পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব তাওরাত, জাবুর, ইনজিল তথা বাইবেল পাঠ করা

জরুরি। শুধু সাম্প্রতিক সময়ে নাজিলকৃত আসমানি কিতাব কুরআন পাঠ করে কোনো লোক পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। তারা বিভিন্ন গল্প ফেঁদে মানুষকে বোঝাচ্ছে, বুনিয়াদি তথা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ না করে যেমন কোনো লোক ডাক্তার হতে পারে না, তেমনই পূর্ববর্তী কিতাবগুলো অধ্যয়ন না করেও কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে না।

তালুকদার সাহেব মাথা নাড়েন। বলেন, হুঁ, মিশনারিদের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে।

: হাসালেন জনাব! আপনি কি জানেন, এইসব যুক্তি বের করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়, গবেষণা করা হয়। আমার মনে হয় জনাব এসব জানেন না। শোনেন, এই বইটির এই জায়গাটাতে দেখেন, দেখেন তো কী লেখা রয়েছে।

তালুকদার সাহেব দেখে বলেন, এ যে দেখছি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা বলে আগের কিতাবগুলো বিকৃত হয়েছে, তারা যেন প্রমাণ হাজির করে। আরও লিখেছে—আসলে যারা এইসব বলে তারা গুরুতর গুনাহের কাজ করে এবং আল্লাহর কালামের কল্যাণ থেকে মানুষকে আড়াল করে রাখে। উপরন্তু তাদের জন্য ভয়ানক আজাবের ফতোয়াও তারা দিয়ে দিয়েছে।

হাসান মাস্টার বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন,

অথচ মজার ব্যাপার হলো। মিশনারিরা আসমানি কিতাব ইনজিল বলে যে বাইবেলের দাবি করছেন, তা আদৌ ঈসা আ.-এর প্রতি অবতীর্ণ ইনজিল নয়। বর্তমানের চালু বাইবেলটি পল ও তার শাগরেদদের দ্বারা রচিত। প্রচলিত বাইবেলের ২৮টি খণ্ডের মধ্যে ১৩টিতেই পলের চিঠি স্থান পেয়েছে। মোটকথা কুরআন থেকে শুরু করে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা দিয়ে, এমনকি খোদ প্রচলিত বাইবেলের অসংগতি দিয়েও প্রমাণ করা যায় যে, বর্তমান খ্রিষ্টধর্ম কোনোভাবেই ঈসা আ. প্রচারিত ধর্ম নয় বরং তা পোলের উদ্ভাবিত গ্রিক ও রোমানদের পুরাণাশ্রিত ধর্ম। আসমানি কিতাব ইনজিলের খোঁজ করতে হলে এখন কুরআনেই করতে হবে। যা হোক, বললে অনেক কথা বলা যায়। অত কথা বলার সময়-সুযোগ কোনোটাই আপনার আমার নেই। কিন্তু জনাব একটি কথা, একজন মুসলমান হিসেবে কি মিশনারিদের ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জকে পাশ কেটে যাওয়ার কোনো রাস্তা আছে?

: আপনি আমি কী করব? সবাই যদি পাশ কেটে যান, তো আমরা কী করতে পারি?